একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The commodification of the female body and the shackles of poverty in Mahasweta Devi's short story 'Stanadayini' (The Breast-Giver)

মহাশ্বেতা দেবীর ‘স্তনদায়িনী’ গল্পে নারীর দেহের পণ্যায়ন ও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল

Name of the Author: Lakshmikanta Karmakar

Affiliation: Guest lecturer, Gour Mahavidyalaya, Malda; Research Scholar, St. Xavier’s College (Autonomous), Kolkata

Abstract: Mahasweta Devi’s short story Breast-Giver (1977) narrates the tragic tale of Jashoda, a destitute Brahmin woman who, in the face of her husband’s disability and extreme poverty, turns her lactating body into a profession. This paper offers a critical analysis of the story through the lens of feminist theory and the sociology of poverty. Employing the theoretical frameworks of Christine Delphy, Gayatri Chakravorty Spivak, Amartya Sen, Michel Foucault, and Lise Vogel, the study demonstrates how ‘professional motherhood’ transforms the female body into a commodity, and how poverty makes this commodification inevitable. Jashoda’s character becomes a symbol of the subaltern woman’s position within patriarchal capitalism. Her body is reduced to a biological resource—worshipped as long as it remains productive, and silently discarded once it becomes useless. The story deconstructs the conventional sacred image of motherhood, exposing the brutal commercialization of women’s reproductive labour and the reality of ‘capability deprivation’. The paper concludes that Breast-Giver is not merely a piece of literature but a document of protest, raising enduring questions about the objectification of the female body and the chains of poverty.

Keywords: Mahasweta Devi, Breast-Giver, commodification of the female body, poverty, professional motherhood, subaltern, capability deprivation.

মহাশ্বেতা দেবীর ‘স্তনদায়িনী’ গল্পে নারীর দেহের পণ্যায়ন ও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল

লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) স্বতন্ত্র অবস্থানের দাবিদার। কেবলমাত্র আখ্যানের জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের বেদনা, প্রতিরোধ ও বাঁচার আকুতি তাঁর লেখার মূল সুর। ১৯৭৭ সালে রচিত ‘স্তনদায়িনী’ গল্পটি সেই ধারার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদা এক নিরন্ন ব্রাহ্মণ নারী, যে স্বামীর পঙ্গুত্ব ও চরম দারিদ্র্যের মুখে নিজের দেহের স্তন্যদান ক্ষমতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। প্রায় তিন দশক ধরে ধনী হালদার পরিবারের সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ায় সে। কিন্তু যখন তার দেহ ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং সে ‘উৎপাদনক্ষমতা’ হারায়, তখন সমাজ ও পরিবার তাকে নিঃশব্দে পরিত্যাগ করে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো নারীবাদী তত্ত্ব ও দারিদ্র্যবিষয়ক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে গল্পটির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ। বিশেষ করে আমরা দেখব কীভাবে ‘পেশাদার মাতৃত্ব’ নারীর দেহকে একটি পণ্যে (commodity) রূপান্তরিত করে, কীভাবে দারিদ্র সেই পণ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে অনিবার্য করে তোলে, এবং কীভাবে মহাশ্বেতা দেবী মাতৃত্বের প্রচলিত ‘পবিত্র’ ভাবমূর্তিকে ভেঙে সমাজের কঠোর বাস্তবতাকে উন্মোচন করেন।

গল্পের পটভূমি গ্রামীণ বঙ্গের এক জমিদারি পরিবার। যশোদার স্বামী কাঙালীচরণ—বলাবাহুল্য যে নামটিই দারিদ্র্যের প্রতীক। সে ময়রার দোকানে কাজ করে। পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর যশোদাই সংসারের প্রধান উপার্জনকারী হয়ে ওঠে। হালদার জমিদার বাড়ির বউদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয় সে। ধীরে ধীরে এটি তার নিয়মিত পেশায় পরিণত হয়। প্রায় পঞ্চাশটি সন্তানকে সে নিজের স্তনের দুধ দেয়—অধিকাংশই তার নিজের নয়, বাবুদের বাড়ির সন্তান। গল্পের মাঝামাঝি যশোদার স্তনগ্রন্থিতে ক্যানসার ধরা পড়ে। হালদারবাবু চিকিৎসার জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করতে রাজি নন। স্বামী কাঙালীচরণও অক্ষম। শেষ পর্যন্ত যশোদা একাকী, উপেক্ষিত, রোগশয্যায় পড়ে থাকে। গল্পের শেষাংশে সে ক্ষুধার কথা বলে—এক নারী যার স্তন আজীবন অন্যদের ক্ষুধা মেটাতে কাজ করেছে, সেই নারী নিজের ক্ষুধা নিবারণের সামর্থ্যও হারায়।

যশোদার দেহের এই বস্তায়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমেই ঘটে না; বরং তা এক ধরনের ‘জৈবিক শাসন’ (bio-power) -এরও শিকার। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault) তার ‘The History of Sexuality’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কীভাবে জনগণের দেহকে ‘শাসন’ ও ‘নিয়ন্ত্রণ’ করার জন্য প্রজনন, স্বাস্থ্য ও যৌনতাকে কেন্দ্র করে এক ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করে। যদিও ফুকো মূলত রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া নিয়ে লিখেছেন, মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে সেই ক্ষমতার কাঠামোটি বেসরকারি জমিদারি ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের স্তরে কাজ করে। যশোদার দেহ কখনোই তার নিজের সম্পত্তি নয়; এটি জমিদার

পরিবারের সন্তানদের জন্য এক 'জৈবিক সম্পদ'। তাঁর স্তন, তাঁর দুধ, এমনকি তাঁর গর্ভধারণের ক্ষমতা—সবই নিয়ন্ত্রিত হয় বাবু-বাড়ির প্রয়োজন অনুসারে। ফুকোর ভাষায়, যশোদার দেহ এক 'উৎপাদনশীল দেহ' (productive body) যাকে 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' (disciplined) করা হয়েছে কেবল অন্যদের জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য। যখন এই দেহ আর উৎপাদনশীল থাকে না, তখন তাকে 'অকার্যকর' ঘোষণা করে ফেলে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় যশোদার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা, ব্যথা বা বেদনার স্থান নেই—সে হয়ে ওঠে এক নিঃস্বার্থ 'যন্ত্রমানবী'।

গল্পের শুরুতেই মহাশ্বেতা দেবী যশোদার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন: "যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশনাল মাদার। বাবুদের বাড়ির বউ-ঝির মতো অ্যামেচার মা ছিল না যশোদা। এ জীবন পেশাদারদের একচেটিয়া।" এই কয়েকটি বাক্য মাতৃত্বের প্রচলিত ধারণাকে আমূল বদলে দেয়। সাধারণত মাতৃত্বকে আবেগময়, স্বাভাবিক ও পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু যশোদার মাতৃত্ব চুক্তিবদ্ধ, বাণিজ্যিক ও পরিমাপযোগ্য। তিনি একটি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশুকে দুধ পান করান। ফরাসি নারীবাদী অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টিন ডেলফি (Christine Delphy) তার 'The Main Enemy' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদে নারীর প্রজননশ্রম ও গৃহস্থালি শ্রমকে 'অমূল্য' বা 'স্বাভাবিক' বলে চিহ্নিত করা হয়, যাতে প্রকৃত শোষণটি লুকিয়ে থাকে। যশোদার ক্ষেত্রে তার দেহের শ্রমের কোনো বাজারদর ছিল না; তিনি পেতেন সামান্য অর্থ ও খাবার, কিন্তু তার উৎপাদিত পণ্যটি অর্থাৎ দুধ ছিল অমূল্য, কারণ সেই দুধে বড় হওয়া শিশুরা জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়।

গল্পের আরেক জায়গায় লেখিকা যশোদার নিরন্তর মাতৃত্বের ব্যস্ততা বর্ণনা করে বলেছেন: "মাতৃত্ব সে সইতে পারে কি পারে না, সে-হিসেব কোনোদিন খতিয়ে দেখতে সময় পায়নি। নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচবার ও অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার উপায়।" এই বাক্যটি প্রমাণ করে যে যশোদার কাছে মাতৃত্ব আর 'সহ্য করার' বা 'উপভোগের' বিষয় নয়; এটি একমাত্র উপার্জনের পথ অর্থাৎ বাঁচবার পথ। এখানে মাতৃত্বকে 'পেশা' বলার মধ্য দিয়ে লেখিকা ইঙ্গিত করেন যে পুঁজিবাদী সমাজে নারীর দেহের কার্যকারিতাকেই পণ্যে পরিণত করা সম্ভব।

নারীবাদী তাত্ত্বিক মার্গারেট জ্যাকসন (Margaret Jackson) ও অ্যান ফার্গুসন (Ann Ferguson) যুক্তি দেখিয়েছেন যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর প্রজনন ক্ষমতা আলাদা করে মূল্যায়িত হয়, কিন্তু সেই মূল্যায়ন কখনো নারীর পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় পৌঁছায় না। যশোদার দেহের একটি নির্দিষ্ট অংশ—স্তন—একটি স্বতন্ত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। গল্পের প্রায় শেষভাগে যশোদার স্তনে ক্যানসার ধরা পড়লে হালদারবাবু উদাসীন কণ্ঠে বলেন: "হঃ। হইলেই হইল ক্যানসার। অতই সোজা। কী শুনতে কী শুনছেন, যান, মলম দিলেই সারব। আপনের কথায় আমি বামুনের মাইয়ারে হাসপাতালে পাঠাইতে পারুম না।"

এই একটি সংলাপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারীকে কীভাবে বস্তু কিংবা যন্ত্রে পরিণত করা হয়। হালদারবাবু যেন বলছেন: 'দরিদ্র নারীর চিকিৎসার দায়িত্ব আমার নয়।' স্তন যখন উৎপাদনক্ষম অর্থাৎ দুগ্ধপূর্ণ, তখন তা পূজিত

হয়; যখন অসুস্থ ও অকেজো হয়, তখন তার চিকিৎসার দায়িত্ব কেউ নেয় না। এটি নারীর দেহের চূড়ান্ত বস্তায়ন—একটি যন্ত্র, ব্যবহারের সময় মূল্যবান, ভাঙার পরে তা আবর্জনা মাত্র। দরিদ্র নারীর সাথেও তাই করা হলো।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ক্যান দ্য সাবল্টার্ন স্পিক?' (Can the Subaltern Speak?) অনুযায়ী, প্রান্তিক নারীর কণ্ঠস্বর কখনোই মূলধারার ইতিহাসে পৌঁছায় না। যশোদা গল্পে খুব কম কথা বলে। সে তার যন্ত্রণা, তার ক্লান্তি, তার দেহের পরিবর্তন কখনো পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করে না। গল্পে আমরা দেখি যখন তার বুকের অবস্থার অবনতি হয়, যখন আগের মতো আর দুগ্ধ উৎপাদন হয় না তখন তিনি স্তন দুটির দিকে তাকিয়ে ভাবেন: "স্তন দুটি বড় শূন্য লাগে, যেন বরবাদ। স্তনবৃন্তে শিশুর মুখ নেই, এ তার জীবনে ঘটবে বলে ভাবেনি।" এই অভ্যন্তরীণ সংলাপটি যেন তার নীরবতারই অংশ—বাইরের জগৎ সে কিছু বলে না, কেবল ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে তার কথোপকথন। যে কথোপকথন শোনার মতো সমাজে কেউ থাকে না। সে যাবে যতদিন তার স্তনে দুধ আছে ততদিনই এই সমাজ তাকে মূল্য দেবে। তার পর তাকে ছেড়ে ফেলে দেওয়া হবে। সেই আশঙ্কা কাজ করে প্রতিনিয়ত।

দারিদ্র্য কেবল যশোদার 'পেশা' নির্ধারণ করে না; এটি তার নারীত্ব ও মাতৃত্বের অভিজ্ঞতাকেও সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে। আমর্ত্য সেনের 'সক্ষমতার অভাব' তত্ত্বের প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে যশোদার প্রতিবাদ ও চিকিৎসার সক্ষমতা নেই। কিন্তু আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, দারিদ্র্য তার কাছে মাতৃত্বের আনন্দটুকুকেও কেড়ে নেয়। গল্পের একটি দৃশ্যে যশোদা তার নিজের সন্তানকে দুধ দিতে পারে না, কারণ তার স্তন বাবু-বাড়ির সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত। এই বিচ্ছিন্নতা নারীর শরীর ও সন্তানের মধ্যে স্বাভাবিক বন্ধনকে ভেঙে দেয়। মার্কসবাদী নারীবাদী লিজ ভোগেল (Lise Vogel) তার 'Marxism and the Oppression of Women' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদী সমাজে নারীর প্রজননশ্রমকে কীভাবে মূল্যহীন করে ফেলা হয় এবং সেই মূল্যহীনতার ফলে নারীর দেহ হয়ে ওঠে এক 'উৎপাদনের হাতিয়ার'। যশোদা যখন নিজের সন্তানকে বুকের দুধ না দিয়ে বাবু-বাড়ির সন্তানকে দেয়, তখন সেই মাতৃত্ব আর 'স্বাভাবিক' থাকে না; এটি একটি 'বিকৃত মাতৃত্ব'—যেখানে দেহের আবেগ বাদ পড়ে, থাকে কেবল পণ্য বিনিময়ের কঠিন হিসাব। এই বিকৃতি দারিদ্র্যের সবচেয়ে নৃশংস দিক—এটি মানবিক সম্পর্ককেও পণ্যে পরিণত করে।

স্পিভাকের ভাষায়, যশোদা 'সাবল্টার্ন'—যেখানে তার কণ্ঠস্বর শোনার কেউ নেই। গল্পের শেষে আমরা দেখি যশোদা মারা যায়—"বাপু, শেষে এক রাতে, যশোদা বুঝল তার পা ও হাত ঠান্ডা হয়ে আসছে। ও বুঝল এবার মৃত্যু আসছে। চোখ খুলতে পারল না যশোদা, কিন্তু বুঝল, কেউ কেউ তার হাত দেখছে। সূচ বিঁধল বাহুতে। ভেতরে শ্বাসের কষ্ট। হতেই হবে। কারা দেখছে? তারা কি তার আপন কেউ? যাদের পেটে ধরেছিল বলে দুধ দেয়, ভাতের জন্য যাদের দুধ দেয়, যশোদার মনে হল সে তো বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি

একা একা মরতে পারে? যে ডাক্তার রোজ দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে ডোম, সবাই তার দুধ ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারও থাকার কথা ছিল। সে কে? কে সে? সে কে?" আসলে কেউ নয়। সত্যিই কেউ শোনে না। গল্প সেখানে শেষ হয়ে যায়। এই নীরব মৃত্যুই প্রকৃত ট্র্যাজেডি।

যশোদার স্বামীর নাম 'কাঙালীচরণ'। নামটির মধ্যেই তার আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত নিহিত। গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে: "জন্ম থেকে সে যেন কাঙালীচরণের বউ।" অর্থাৎ যশোদার পরিচয় শুরু হয় তার স্বামীর দারিদ্র্যের মাধ্যমেই। কাঙালীচরণ ময়রার দোকান থেকে চুরি করা সিঙাড়া-জিলিপি এনে সংসার চালায়। এই চরম অভাবের মধ্যেই যশোদা 'পেশাদার মাতৃত্ব' বেছে নিতে বাধ্য হয়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ আমর্ত্য সেন (Amartya Sen) তার 'Poverty and Famines' গ্রন্থে যুক্তি দেন যে দারিদ্র্য কেবল আয়ের অভাব নয়, বরং 'সক্ষমতার অভাব' (capability deprivation)। যশোদার কাছে প্রতিবাদ করার, চিকিৎসা নেওয়ার, নিজের দেহের মালিক হওয়ার 'সক্ষমতা'টুকুও নেই। তিনি শুধু বাঁচার তাগিদে নিজের দেহকে পণ্যে পরিণত করেন।

গল্পের একটি ঘটনায় রাঁধুনীর যৌন হয়রানি নিয়ে কথা ওঠে। যশোদা কিছু বলতে চাইলে স্বামী তাকে ধমক দেয়। কারণ, "ভাতার চেনে না, বাবু-বাড়ি চেনে। বাবু-বাড়ি ওর ইষ্টিদেবতা।" অর্থাৎ স্বামী জানে না, কিন্তু যশোদা জানে—বাবু-বাড়ি তার ইষ্টিদেবতা, কারণ সেই বাড়ি থেকেই অন্ন আসে। দারিদ্র্য এখানে নৈতিক সঙ্কট তৈরি করে: যশোদা জানে যে অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে পারে না, কারণ প্রতিবাদ করলে তার উপার্জনের পথ বন্ধ হবে। এটি দারিদ্র্যের এক নৃশংস দিক—মানুষকে তার বিবেকের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য করে।

'স্তনদায়িনী' নামটির ভেতরেই এক গভীর প্রতীকী দ্বান্দ্বিকতা আছে। পৌরাণিক সাহিত্যে দেবীমাতৃকা দেবী যেমন অদিতি বা কাত্যায়নী স্তন্যদানের মাধ্যমে বিশ্ব রক্ষা করেন। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী সেই উপকথাকে উল্টে দেন। যশোদার স্তন অনেক সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে বড় করে তুলেছে কিন্তু পাশাপাশি সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। গল্পের একটি দৃশ্যে যশোদা তার বুকের দিকে তাকিয়ে ভাবে: "স্তনবৃন্তে শিশুর মুখ নেই" —এ যেন এক 'বিপরীত জন্মদান': যে অঙ্গ জীবন দেয়, সেই অঙ্গই মৃত্যু ডেকে আনে।

লেখিকা এখানে মাতৃত্বের পবিত্র আবরণ ছিঁড়ে দেখান যে এই 'পবিত্রতা' আসলে এক সামাজিক নির্মাণ, যা নারীর প্রকৃত শোষণকে লুকিয়ে রাখে। উৎপল মন্ডল ও কামনা মজুমদার তাদের গ্রন্থ 'মহাশ্বেতার গল্প: মহাশ্বেতার সন্ধানে' তে দেখিয়েছেন যে মহাশ্বেতা দেবী প্রায়শই পুরাণের বিপরীত পাঠ তৈরি করেন, যেখানে নিপীড়িত নারীরাই হয়ে ওঠেন আসল ট্র্যাজিক নায়িকা।

'স্তনদায়িনী' গল্পটি ১৯৭৭ সালে রচিত হলেও আজও তা ভয়াবহভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে সারোগেসি, ডোনার মাদার, দুগ্ধ ব্যাংক (milk bank) প্রভৃতি পেশায় নারীদের দেহ আবারও পণ্যে পরিণত হচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলিতে ভাড়াটে মায়েরা প্রায়ই দরিদ্র সম্প্রদায় থেকে আসেন, এবং তাঁদের দেহের জৈবিক সেবা মূলধনী বাজারে বিক্রি হয়। শিপ্রা দত্ত তার 'মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলো শুধু সাহিত্য নয়, বরং একটি সমাজতাত্ত্বিক দলিল, যা সমাজে ঘটে চলা শোষণের চিত্রগুলিকে চিহ্নিত করে। আমাদের সমাজে নারী যতক্ষণ উৎপাদনশীল অর্থাৎ প্রজননশীল থাকে, ততক্ষণ পূজিত হয়; অকেজো হয়ে গেলে উপেক্ষিত। অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় তার 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে যশোদার ক্যানসার কেবল একটি রোগ নয়, বরং এক বিকৃত সমাজের প্রতীক।

মহাশ্বেতা দেবী যশোদার চরিত্রের মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন: একটি সমাজ যেখানে নারীর দেহকে শুধুমাত্র 'উৎপাদনের যন্ত্র' হিসেবে দেখে, সেই সমাজ কি সত্যিই সভ্য? দারিদ্র্য ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের মিলিত আঁতাতে নারী যখন নিজের দেহের মালিক হতে পারে না, তখন 'মাতৃত্বের পবিত্রতা' নামক আদর্শটি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পরিবর্তে এক চরম নিষ্ঠুরতার ছবি আমরা দেখি। 'স্তনদায়িনী' নিছক একটি গল্প হয়ে থাকেনি; এটি একটি প্রতিবাদী চেতনা যেখানে সমাজের কঠিন বাস্তবটিকে তুলে ধরা হয়েছে। যে বাস্তবতা নারীকে পণ্য করাকে প্রশ্ন তোলে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

দেবী, মহাশ্বেতা। 'স্তনদায়িনী'। শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনায় সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

সহায়ক গ্রন্থ

- Delphy, Christine. The Main Enemy: A Materialist Analysis of Women's Oppression. Women's Research and Resources Centre, 1977.
- Foucault, Michel. The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Translated by Robert Hurley, Vintage Books, 1990.
- Sen, Amartya. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford University Press, 1981.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, University of Illinois Press, 1988, pp. 271-313.
- Vogel, Lise. Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory. Rutgers University Press, 1983.
- মন্ডল, উৎপল ও কামনা মজুমদার। মহাশ্বেতার গল্প: মহাশ্বেতার সন্ধানে। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২।
- দত্ত, শিপ্রা। মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন। অক্ষর পাবলিকেশন্স, আগরতলা ও কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, অরুনকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।